বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২০ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
০৪ ডিসেম্বর ২০১১

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি (সিএইচটিডিএফ)-এর যৌথ উদ্যোগে ০৫ ডিসেম্বর হতে ০৯ ডিসেম্বর-২০১১ পর্যন্ত '৫ম সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব' এর আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের রয়েছে সমৃদ্ধশালী ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং স্বতন্ত্র ঐতিহ্য যা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বর্ণাঢ্য ও বহুমাত্রিক করেছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়সমূহের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুরক্ষা ও প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমি আশা করি এই 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব-২০১১' পার্বত্য এলাকাসহ সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরতে ও তাদের ঐতিহ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি এই উৎসবের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০ অগ্রহায়ণ ১৪১৮
০৪ ডিসেম্বর ২০১১

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি'র (সিএইচটিডিএফ) যৌথ উদ্যোগে ৫ম সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব ৫-৯ ডিসেম্বর ২০১১ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক মাইলফলক। এ চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের জাতিগত সংঘাত বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির জন্য ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এ চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিরই প্রতিফলন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট। সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে আমরা দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করেছি।

আমি আশা করি, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব ২০১১ পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি, উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় করবে।

আমি ৫ম সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব ২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শেখ হাসিনা

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী এম.পি
সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

শুভেচ্ছা বাণী

সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতার দেশ হচ্ছে আমাদের এ বাংলাদেশ। এ দেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সংস্কৃতি, আচার ও কৃষ্টি বিষয়ক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব-২০১১ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশনাকে স্বাগত জানাই।

বিগত কয়েক বছর ধরে আয়োজন করা হচ্ছে এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলে বসবাসকারী এ সকল জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক গৌরবগাঁথা অর্জন ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব ইতোমধ্যেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীসহ বিদেশীদের মাঝেও সৃষ্টি করেছে ব্যাপক উৎসাহ ও সচেতনতা। বিভিন্ন জাতিসত্তার শিল্প সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার আগ্রহ সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি (সিএইচটিডিএফ) যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আমি তার সাফল্য কামনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই উৎসবের মাধ্যমে এদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাবে। এ উৎসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বহু বছরের চর্চিত স্থানীয় কৃষ্টি রক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এমপি)

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব: সম্প্রীতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বাস করে আসছে স্বকীয় পরিচয় ধরে রাখা অনেকগুলো জনগোষ্ঠী, যেগুলো সংখ্যার বিচারে বৃহত্তর বাঙালির জনগোষ্ঠীর তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিক থেকে বৈচিত্র্যের বিপুল ভাণ্ডার ধারণ করছে সামষ্টিকভাবে। তবে শুধু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মানদণ্ডেই নয়, এদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নির্মাণেও এ জাতিসত্তাসমূহ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে সাঁওতাল, হাজং, গারোসহ আরো অনেক জনগোষ্ঠীর সংগ্রামের ঐতিহ্যও। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষা তথা বাঙালি সংস্কৃতি এবং আধুনিক বাঙালি জাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পেছনে রয়েছে বর্তমানের 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' প্রভৃতি নামে পরিচিত বহু জনগোষ্ঠীর পূর্বসূরীদের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সংশ্লেষণ। কাজেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই জনগোষ্ঠীসমূহ যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লালন করে চলেছে তা এদেশে জাতীয় ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং এই বৈচিত্র্যের বিকাশ ও প্রসার মানে জাতীয় ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি।

উপরে উল্লিখিত উপলব্ধির আলোকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এ বছরের ডিসেম্বর ৪ থেকে ৯ তারিখে ঢাকায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব', যার মূল বাণী হলো 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের বন্ধন'। উৎসব আয়োজনে সহযোগিতা করছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)'র পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি (সিএইচটিডিএফ), যাদের সহায়তায় প্রতিবছর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এই উৎসব পালনের রেওয়াজ শুরু হয় ২০০৭ সালে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এই পটভূমি থেকেই এসেছিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব আয়োজনের প্রেরণা।

সকলেই জানেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোর একটি, যেটি ১৯৯৭ সালের চুক্তির আগে অশান্ত ছিল দীর্ঘ প্রায় আড়াই দশক যাবত। ফলে এ অঞ্চলে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে তুলনামূলকভাবে কম মাত্রায় বা দেরিতে। সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের একটা বড় অংশ বহুকাল বাস করেছে পর্যাপ্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধাবিহীন বিভিন্ন দুর্গম জনপদে। তবে তারাও স্বপ্ন দেখে দারিদ্র ও সংঘাতমুক্ত একটি উন্নততর ভবিষ্যতের। তাদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি রাজনৈতিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে। সেই সূত্র ধরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উন্নয়নে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে এদেশের উন্নয়ন সহযোগীরা, যাদের সহায়তার একটা বড় অংশ পরিবাহিত হয়ে আসছে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউএনডিপি'র কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসহ বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। সেসাথে অন্যান্য সংস্থা তথা সরকারের নিজস্ব উন্নয়ন কার্যক্রম উত্তরোত্তর গতি, বিস্তৃতি ও সাফল্য অর্জন করে চলেছে বিগত বছরগুলোতে। এই প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মানে এখন আর শুধু অনগ্রসরতা, দুর্গমতা, দারিদ্র্য বা সংঘাত নয়। বরং শান্তির বাতাবরণ আর উন্নয়নের ধারা জোরালো হওয়ার সাথে সাতে ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছে এই অঞ্চলের অপার সম্ভাবনার দিগন্ত, যেখানে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল সম্ভার, বিরল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সমাহার এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের অমূল্য বৈভব। এগুলোকে সযত্নে লালন করেই এলাকার তথা দেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এই প্রত্যাশাকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য জাতীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হলো 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব' উদ্‌যাপনের অন্যতম লক্ষ্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরেও অবশ্য নৈসর্গিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যকে ধরে রেখে আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন ধারণ করে বাস করছে আরো অনেক সংখ্যালঘু জাতিসত্তা, সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যাদের ঘনত্ব বেশি– যেমন চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি এলাকা, গড়াঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা ও উত্তরবঙ্গ। এরকম সকল জাতিসত্তা মিলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে করে তুলেছে আরো বর্ণিল। কাজেই পাহাড় ও সমতলের সকল জাতিসত্তাকে 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব' উদ্‌যাপনের আওতায় রাখা হয়েছে বেশ ক'বছর ধরে। অর্থাৎ এই 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব' পরিণত হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন জাতিসত্তাভুক্ত জনগোষ্ঠীর মানুষদের একটি বাৎসরিক মিলনমেলায়। একইসাথে উৎসবটি সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের সাথে বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মেলবন্ধন আরো সুদৃঢ় করার একটি অন্যতম প্রয়াসও বটে।

২০১১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ণ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০ বছর, আর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৪ বছর। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রের স্বপ্ন নিয়ে, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাস করবে, যেখানে থাকবে না শোষণ-নিপিড়ন-বঞ্চনা-বৈষম্য। স্বাধীনতার ৪০ বছরেও এই স্বপ্ন এখনো আমাদের পুরোপুরি নাগালে আসেনি, যেমন তিন পার্বত্য জেলাসহ সংখ্যালঘু জাতিসত্তা অধ্যুষিত অনেক প্রত্যন্ত জনপদে উন্নয়নের মূল স্রোতধারা এখনো পুরোপুরি পৌঁছাতে পারেনি। তবে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা একেবারে থেমেও থাকেনি। তাই, আগেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছিল, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মাধ্যমে সেখানে দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময়কাল ধরে বিরাজমান অশান্ত অবস্থার অবসান ঘটেছিল, সূচিত হয়েছিল শান্তি ও উন্নয়নের পথে সে অঞ্চলের নতুন যাত্রা। এটা ঠিক যে, এখনো এই যাত্রাপথ পুরোপুরি মসৃণ হয়নি, সেখানে এখনো রয়েছে বেশ কিছু বাধা। কিন্তু সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এ অঞ্চলের মানুষকে, তথা সমগ্র বাংলাদেশকে। আর এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইপ্সিত গন্তব্যে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। এই আন্তরিকতার প্রতিফলন ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনে, যে চুক্তির পূর্ণতর বাস্তবায়নে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। একইভাবে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে সম্প্রতি সংবিধানের যে পঞ্চদশ সংশোধনী হয়ে গেল, তাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় সংযোজিত হয়েছে ২৩.ক অনুচ্ছেদের মাধ্যমে, যা নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। এই অনুচ্ছেদের ভাষা নিয়ে কিছু আপত্তি থাকতেই পারে বা এটিকে আরো পরিমার্জিত করার দাবিও উঠতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ভিন্নমত প্রকাশ করা বা দাবি জানানো হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, এটিই প্রত্যাশিত হবে। সে যাই হোক, যে বিষয়টি নিয়ে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই, সেটি হল, যে লক্ষ্য নিয়ে ঢাকায় কয়েক বছর ধরে 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব' উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে, এই প্রথমবার তার পেছনে যুক্ত হয়েছে সুস্পষ্ট একটি সাংবিধানিক রক্ষাকবচ বা দিকনির্দেশনা। আসুন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব পালনের সময় আমরা এবছর সবাই মিলে এই প্রাপ্তির ও যথাযথ মূল্যায়ন করি, এবং এটিকে সমুন্নত রাখা এবং প্রয়োজনে আরো পরিমার্জিত পরিশোধিত করার জন্য আমরা দল-মত-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে একজোট হয়ে কাজ করি।

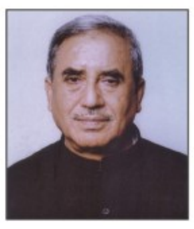

আবুল কালাম আজাদ, এমপি
মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি (সিএইচটিডিএফ) কর্তৃক 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব-২০১১' উদযাপন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশে সেখানকার দীর্ঘ রাজনৈতিক হানাহানি ও সশস্ত্র সংগ্রাম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির ফলে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বিকাশে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব-২০১১' পার্বত্য অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মেলবন্ধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

২৪/১১/১১

আবুল কালাম আজাদ, এমপি

দীপংকর তালুকদার, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি (সিএইচটিডিএফ) এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতি বিকাশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব-২০১১ উদযাপন উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

উন্নত জীবন সংস্কৃতির বৈচিত্র্য পুরো জীবনপ্রণালীকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে ফেলে। সমাজের প্রতিটি স্তরে সংস্কৃতি, আচার ও কৃষ্টির ভিন্নতা আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিকশিত না করে তাদের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে বার বার। দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা এ অঞ্চলের সংস্কৃতি বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যার পর দীর্ঘদিন ধরে এ বিশেষ অঞ্চলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা আর সংশয় দেখা দেয়। জাতীয় জীবনেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে থাকে। সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সুদূরপ্রসারী দর্শনের ফলে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার ফলে এ অঞ্চলের বিভীষিকাময় অবস্থার সমাপ্তি ঘটে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় পারস্পরিক সহনশীলতা আর সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি পালন করে চলেছে। পার্বত্য অঞ্চলসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিকাশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব-২০১১ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

আমি এ উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

০৪.১২.১১

(দীপংকর তালুকদার, এমপি)

ভারপ্রাপ্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালী সকল অধিবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানা পদেক্ষপ নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি (CHTDF) প্রকল্প পার্বত্য তিন জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ঐ এলাকার অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যও কাজ করে চলেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে গত কয়েক বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতলের বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব' উদযাপিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামনে উপস্থাপন ও প্রচার এবং বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের বন্ধন প্রতিষ্ঠা এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য।

পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রচনার মহৎ লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উৎসব' সফল হোক–এ কামনা করি।

(নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি)
ভারপ্রাপ্ত সচিব